Vol. 44 | No. 2 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন ভারতে নারী : বেদে ও মনুসংহিতায়

Volume	44
Issue	2
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বাসুদেব ঘোষ
Published online	February 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v44i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.6
Pages	৯৯-১১৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ চুয়াল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৭ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০১ (প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০২)

Check for updates

প্রাচীন ভারতে নারী : বেদে ও মনুসংহিতায়

বাসুদেব ঘোষ*

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণস্বরূপ। এতে প্রতিফলিত হয় সমাজ নাগরিকের হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-বেদনা, সুখ দুঃখের ছন্দপাতনিক নানাবিধ সুর। সাহিত্যিক যেহেতু সমাজের অংশ, সামাজিকের প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুভূতিপ্রবণ; সেহেতু তাঁর বিন্যাসকৃত সাহিত্যে সমাজ প্রতিবিম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং স্বভাবসংগত। ইতিহাসের সাহায্যে যেমন অতীতের সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, তথা নিরীক্ষণ করা যায়, তেমনি সাহিত্যের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় দূর এবং নিকট অতীতকে। বৈদিক যুগের কালসীমা চিহ্নিত ন্যূনকল্পে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে।[১] প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক চিত্র লাভের একমাত্র আশ্রয় বৈদিক সাহিত্য তথা প্রধানত *ঋগ্বেদ*। আর *ঋগ্বেদ* হচ্ছে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যমণি, প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। এর অসংখ্য সূক্তে কিংবা ঋকে লুকিয়ে আছে তৎকালীন সমাজজীবনের লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির বহুবিধ চিত্র। সমাজের ক্রমবিবর্তন ও ধারাবাহিকতার রূপটি সবিস্ময়ে অবলোকন করা যায় *ঋগ্বেদ*সহ অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে। এ সমস্ত গ্রন্থপাঠে তদানীন্তন সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যেমন অবহিত হওয়া যায় তেমনি অবগত হওয়া যায় প্রাচীন ভারতে নারীর শিক্ষা, দীক্ষা তথা সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধেও। এই নারীকে নিয়ে প্রাচীন ভারতের সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম কিভাবে আবর্তিত হয়েছে, সেদিকটি পর্যালোচনা তথা অন্বেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নারীর অবস্থান

ঋগ্বেদের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে তখন একান্নবর্তী পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হতো। যদিও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা সকল সময়েই কিছুটা প্রতিকূল হয়ে থাকে তথাপি কন্যার জন্ম অবাঞ্ছিত ছিলো না পিতা-মাতার নিকটে। এ কথা অনুমানে স্বীকার্য, পিতৃপ্রধান সমাজে পুত্রসন্তান আবশ্যক; বংশধারাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে। মনে হয় *ঋগ্বেদের* প্রার্থনাংশে সন্তান কামনার সময় প্রধানত পুত্র-পৌত্রের কামনাই ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু কন্যাসন্তান বিবাহোত্তরকালে অন্য বংশে চলে যাবে সেহেতু হয়তো তাকে (কন্যাকে) প্রার্থনীয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এ থেকে এটা

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রমাণিত হয় না, কন্যাসন্তান পিতা-মাতার কাছে অবাঞ্ছিত ছিল। অন্ততপক্ষে *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায় :

> শিক্ষিত পুত্রের মতোই শিক্ষিতা কন্যা পিতামাতার একান্ত কাম্য।[২]

পিতা যে কেবল বিদ্বান পুত্রের কামনা করতেন তা নয়, দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যার জন্মের জন্যও তাঁদের অত্যুগ্র বাসনা ছিল। *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* এ কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, "যদি কেউ দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যা লাভ করতে ইচ্ছুক হন; তাহলে তিনি তাঁর পত্নীকে হব্য মিশ্রিত তিল তণ্ডুল রন্ধন করে সেবন করাবেন।"[৩] বোঝা যায় বৈদিক যুগের সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল সুন্দর, শোভন এবং সমুন্নত। এ কথা *ঋগ্বেদের* মন্ত্রে, পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে রমণীকুলের প্রতি কোনো প্রকার অসহিষ্ণু বা অশ্রদ্ধার ভাব কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীনকালের আর্যঋষিগণ অন্তরের উপলব্ধির মাধ্যমে অনুভব করেছিলেন, যেমন ব্যবহারিক জীবনে তেমনি ভাবজগতে পুরুষের সাথে রমণীগণ যূথবদ্ধভাবে সমানাধিকার সম্পন্না। এ কথা তাঁরা লৌকিক জগতের সামনে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমাধিকার ও স্বাচ্ছন্দচারিণী ছিলো রমণীকুল।

শিক্ষা

বৈদিক যুগের প্রাথমিক অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়ে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য নামে অভিহিত হতো। জীবনের প্রথমাংশই ছিলো এর কার্যক্রম। বৈদিক সভ্যতা বা সাহিত্যে এটি একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বেদে নারী শিক্ষা-সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। সেসময়ে নারীদের জন্য কোনো বিদ্যানিকেতন ছিল কি না সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট উক্তি বেদে নাই। তথাপি সহজেই নারী শিক্ষার মান অনুমান-প্রমাণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। সেই যুগে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা নারীঋষির সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের ব্রহ্মবাদিনী[৪] রূপে অভিহিত করা হয়েছে *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থে। ঋষি রোমশা, ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা ও অপালা, ঋষি কক্ষিবৎকন্যা ঘোষা, সাবিত্রী সূর্যা, অম্ভৃণকন্যা ঋষি বাক্, ঋষি ইন্দ্রানী, ঋষি শ্রদ্ধা, ঋষি ইন্দ্রমাতা, ঋষি যমী, ঋষি বসুক্রজায়া, ঋষি উর্বশী এবং ঋষি সরমা এঁরা সবাই *ঋগবেদের* কোনো না কোনো দ্রষ্টা ঋষি।[৫] এছাড়াও কিছু সংখ্যক নারী ঋষির নাম জানা যায়, যাঁরা *ঋগবেদের* সাথে জড়িত। যেমন জুহু, শাশ্বতী, শ্রী, গোধা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহুনাম্নী, ব্রহ্মজায়া, অদিতি, নদীসকল, নারী, স্ত্রী, লক্ষ্মণা, মেধা, দক্ষিণা, লোমশা পৌলোমী, কাক্ষীবতী, জবিতা, কাময়নী, নোধা, গোপায়না, শিকতা, নিরাবরী প্রভৃতি নারী ঋষির নামোল্লেখের মাধ্যমে[৬] প্রমাণিত হয় তৎকালীন বৈদিক ভারতে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষানিকেতন ছিল। আরো জানা যায়, সে যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ তিনটি উচ্চবর্ণের নারীদের বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণাধিকার ছিল এবং তাঁরা অধ্যাপনার কাজও করতেন। এ ছাড়া বৈদিক সাহিত্য, সংহিতায় প্রভূত নারী অধ্যাপিকা, শিষ্যা, তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। তবে শূদ্র জাতির বেদাধ্যয়নের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা ছিল কি না তার সুস্পষ্ট ধারণা বা উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না।

উপনয়ন

*ঋগ্‌বেদসংহিতা*র কাল হতে সূত্রসাহিত্যের কাল পর্যন্ত তিনটি উচ্চ জাতির নারীকে উপনয়নের মাধ্যমে দীক্ষা দেওয়ার বিধি প্রচলিত ছিল। তাঁরা উপনয়নকালে গায়ত্রী শিবস্‌মন্ত্র উচ্চারণ[৭] করতেন। এবং বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে স্মৃতিকার যম বলেছেন :

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যাতে।
অধ্যাপনং চ বেদনাং সাবিত্রী বচনং তথা।[৮]

প্রাচীনকালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের মাধ্যমে নারীগণ উল্লিখিত উপায়েই উপনয়ন[৯] সংস্কারে অভিষিক্ত হতেন। এই উপনয়ন প্রথা ছিল তদানীন্তন যুগের একটি বিশেষ বিধি-বিধান। ভারতীয় আর্য-শাখায় এই প্রথা কালের বিবর্তনে অবলুপ্তির ধারায় লীন হয়ে গেছে; তথাপি ইরানীয় আর্য-শাখায় এর প্রচলন বলবৎ আছে এবং অব্যাহত গতিতে চলছে। আজ অবধি জরথুস্ত্র[১০] সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীগণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্যমে অভিষিক্ত হয়ে থাকেন। এবং তাঁরা উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হন। যে উৎসবের মাধ্যমে নারীগণ সংস্কৃত হতেন, সেই উৎসবকেই বলা হতো নওজোত (নবজন্ম) সংস্কার।[১১]

বিভাগ এবং বিবাহ

বৈদিক সমাজে ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ অভিধায় অভিহিত নারীদের দু'টি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে উপনয়ন প্রথায় অভিষিক্ত হতেন শুধুমাত্র ব্রহ্মবাদিনী রমণীগণ। এঁরা পবিত্র অগ্নিকে সংরক্ষণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পুরুষের ন্যায় চিরকৌমার্য ব্রত পালনে নিরত থাকতেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন না এঁরা কোনোদিন। অন্যদিকে সদ্যোবধূ রমণীগণকে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করা হতো। এবং একটি উৎসবের মাধ্যমে বিবাহ দেওয়ার সুব্যবস্থা ছিল বৈদিক সমাজে।[১২] এই সদ্যোবধূ রমণীগণ বিবাহের পূর্বে সাধারণত ষোল থেকে সতের বৎসর বয়স অবধি শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। এবং শিক্ষা সম্পন্ন হবার সাথে সাথেই বিবাহ কার্যে অগ্রসর হতো। বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন একেবারেই ছিল না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়েই নারীরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতো, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে রমণীগণের বিবাহযোগ্য বয়স[১৩] সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ না থাকলেও *যজুর্বেদ* (৮/১) অথবা *অথর্ববেদে* (১১/৫) বলা হয়েছে, "ব্রহ্মচর্যাবস্থা যথাযথভাবে যাপন করে রমণীগণ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতো।"[১৪]

পতি নির্বাচন

বৈদিকযুগে নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল পতি নির্বাচনের ব্যাপারে। 'স্বয়ং সা মিত্রং বণুতে জনে চিৎ'[১৫]—*ঋগ্‌বেদের* উক্ত মন্ত্রটি এ বিষয়ের প্রমাণ। *ঋগ্‌বেদের* প্রথম মণ্ডলে বলা হয়েছে: "হে বলবান ইন্দ্র! যেমন আকাঙ্ক্ষাবতী পত্নী আকাঙ্ক্ষাবান পতিকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি মেধাবিগণের স্তুতি তোমাকে স্পর্শ করে।"[১৬] এবং "যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার (নিজ) মনের মতো প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।"[১৭]

বৈদিক যুগে অন্তত *ঋগ্বেদের* সময়ে শুধু রাজকন্যাগণ নয়, সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতা রমণীই মনের মতো পাত্র নির্বাচনের অধিকার ভোগ করত। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে রাজকন্যাদের স্বয়ংবর-সভাতে বর নির্বাচন করতে দেখা যায়।[১৮] তবে কন্যা পতি নির্বাচন করলেও তাকে বসন-ভূষণে সাজিয়ে সম্প্রদান করার সু-ব্যবস্থা ছিলো। "যেমন জামাতাকে কন্যা দানের সময় বসন-ভূষণে সজ্জিত করে সম্প্রদান করে তেমনি আমি এই স্তবকে অলংকৃত করেছি।"[১৯] অবাঞ্ছিত জামাতার ক্ষেত্রে কন্যাপণ দিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকদের মনোরঞ্জনের কথা পাওয়া যায়।[২০] আবার একইরকমভাবে কন্যার কোনো শারীরিক ত্রুটির ক্ষেত্রে বরপণ বা যৌতুক দেওয়ার রীতিও ছিলো।[২১] কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা প্রয়োজনে যৌতুক দিয়েও কন্যাদের বিবাহ দিতেন। তবে বৈদিক যুগে মেয়েদের যে বিবাহ করতেই হবে এমন কোনো সামাজিক বিধান বলবৎ ছিল না।

পিতৃগৃহে অনূঢ়া কন্যা

ঋগ্বেদের মন্ত্রে পিতৃগৃহে বসবাসকারী অনূঢ়া কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সমস্ত অনূঢ়াকন্যা যে পৈতৃক সম্পত্তির সমান ভাগ পেত তারও উল্লেখ আছে *ঋগ্বেদে*। যেমন বেদে বলা হয়েছে : "হে ইন্দ্র ! যাবজ্জীবন পিতা-মাতার সঙ্গে অবস্থিত দুহিতা যেমন নিজ পিতৃকুল থেকেই (সম্পত্তির) ভাগ প্রার্থনা করে, তেমনি আমি তোমার নিকট থেকে ধন প্রার্থনা করছি।"[২২] এ থেকে বোঝা যায় পিতার সম্পত্তিতে অনূঢ়া কন্যার অধিকার ছিল কিন্তু বিবাহিতা কন্যার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। তবে তিনি সম্মানিতা হতেন। *ঋগ্বেদের* তৃতীয় মণ্ডলের একত্রিশ সূক্তের প্রথম দু'টি ঋকের মাধ্যমে জানা যায়, পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করে শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতা[২৩] জাত পৌত্রপ্রাপ্ত হন। বৈদিকযুগে অপুত্রক পিতা তার কন্যার বিবাহের সময় জামাতার সঙ্গে এরূপ চুক্তি করতেন যে, ওই কন্যার ঔরসজাত পুত্র কন্যার পিতার হবে এবং দৌহিত্র হয়েও পুত্রের কার্য করবে।[২৪] দ্বিতীয় ঋক হতে জানা যায়, পুত্র-কন্যা উভয়ই থাকলে পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হবে, কন্যা সম্পত্তি পাবে না। পুত্র হবে পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী। কন্যা হবে সম্মানিতা।

বহুবিবাহ

বহুবিবাহ প্রথা তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে।[২৫] তবে মেয়েদের বহুবিবাহ বা একাধিক পতিগ্রহণের অধিকার প্রথম দিকে *ঋগ্বেদের* যুগে ছিল,[২৬] কিন্তু পরবর্তীসময়ে প্রতিষ্ঠিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। তবে *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে "কোনো নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয়, তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য পতিরা তার পতি নয়।"[২৭] একথা বলার তাৎপর্য সম্ভবত ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রকাশ তথা অন্যান্য বর্ণের প্রতি বিদ্বেষ অথবা হীনত্ব প্রতিপাদন করাই মন্ত্রকার ঋষি কবির উদ্দেশ্য। সে জন্য নারীর দশস্বামী-গ্রহণের উল্লেখ প্রকৃত কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে উপস্থাপিত করছে কি না তা বলা কষ্টসাধ্য। আবার অন্যান্য সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এ বিষয় সুস্পষ্ট নিষেধ পাওয়া যায়। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* এবং ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, "যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে দু'টি

বস্ত্রখণ্ড; তাই পুরুষ দু'জন স্ত্রী গ্রহণের অধিকারী; একটি বস্ত্রখণ্ডকে দু'টি দণ্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ।"[২৮]

দাম্পত্য জীবন

বহুবিবাহের প্রচলন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের মধ্যে বিরাজমান থাকলেও বৈদিক যুগের সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ উচ্চই ছিল, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই বলে মনে হয়। সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অত্যন্ত সুখে শান্তিতে যৌথ জীবন-যাপনের মাধ্যমে পরিবারে পরমতৃপ্তির সুবাতাস প্রবাহিত হতো তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। *ঋগ্‌বেদে* বিবাহের যে মন্ত্রসমূহ পাওয়া যায় তা থেকে বিবাহ বন্ধনের[২৯] গভীরতা ও পবিত্রতা যেমন অনুমেয় তেমনি ঘর ও সমাজজীবনে নারীর সম্মানিত শীর্ষস্থান সহজেই অনুমিত হয়। *ঋগ্‌বেদের* দশম মণ্ডলের ১০/৮৫ সূক্তে নববধূকে উদ্দেশ্য করে যা বলা হয়েছে তা থেকে স্বামী-বাড়িতে নববধূর আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়— "তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব করো, শ্বশ্রূকে বশীভূত করো, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় আচরণ করো।"[৩০]

এ প্রভুত্ব অবশ্য শক্তির নয়, স্নেহমমতা তথা সম্মানের। বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মাঙ্গলিক একীকরণই আদর্শ বলে গণ্য হতো। দিব্যজ্ঞানের অধিকারিণী নারী ঋষির কাছেও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সুস্থিতি সব কিছুর চেয়ে বেশি কাম্য ছিল। অগ্নিগোত্রজা বিশ্ববারা অগ্নির স্তুতি করতে গিয়ে একটি মন্ত্রে প্রার্থনা করেছেন; "হে অগ্নি! আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য শত্রুদের দমন কর। তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করো।"[৩১] এখানেও পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সাবলীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে গৃহিণী রূপে রমণী বহুবিধ দায়িত্ব পালন করে। *ঋগ্‌বেদের* মন্ত্রে উপমার মধ্য দিয়ে রমণীর এই পারিবারিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে— "গৃহিণী যেমন জাগরিত হয়ে সকলকে জাগরিত করে উষাও জগজ্জনকে তেমনি জাগরিত করেন।"[৩২]

যাগ-যজ্ঞাধিকার

শুধুমাত্র পার্থিব গৃহ কর্মে নয়, অপার্থিব ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও নারীর অকুণ্ঠাধিকার সংরক্ষিত ছিল। *শতপথ ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে— 'অযজ্ঞিয়ো বা এষ যোৎপত্নীক' অর্থাৎ অপত্নীক ব্যক্তির যজ্ঞে কোনো অধিকার নেই। তদানীন্তন সমাজে সপত্নীক যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। নারী ও পুরুষ এক সঙ্গে যজ্ঞ কার্য সুসম্পাদন করত। এ বিষয়ে *ঋগ্‌বেদে* প্রমাণ রয়েছে— "হব্য প্রদায়ী যজমান, হব্য প্রদায়ী অধ্বর্যু প্রভৃতির সাথে ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্য দ্বারা অর্চনা করেন; ইন্দ্র তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন। হে উগ্র ইন্দ্র ! মর্ত্যহোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করে স্ত্রী-পুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছেন।"[৩৩] প্রতিটি প্রধান যজ্ঞে 'পত্নীসংবাদ' নামে একটি যাগ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে যজমান পত্নীর অংশগ্রহণ তথা বেদের কিছু মন্ত্র তাঁর পঠনীয় ছিল। *ঋগ্‌বেদের* অন্তর্গত কতকগুলি মন্ত্র যেমন— "তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতিই

তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণ হব্যদানপূর্বক তোমার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ করছে... ।"[৩৪]

বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যজ্ঞকার্য সম্পাদনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'পত্নী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে পাণিনি 'পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে'— এই সূত্রটি প্রণয়ন করেছেন। এর অর্থ হলো 'স্বামীকে কেবল যজ্ঞকর্মে সহায়তা করার অর্থেই 'পতি' শব্দের সাথে 'ন' প্রত্যয় যুক্ত হবে। সুতরাং শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্ত্রী শব্দটির সমানার্থক 'পত্নী' শব্দের অর্থ হলো যজ্ঞকর্মে পতির সহযোগিনী। 'পতি' ও 'পত্নী' উভয়ই হোতা হবার যোগ্যতা রাখে। অভিমত হলো, সহধর্মিণীও উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যের দ্যোতক। এককভাবে নারীর যজ্ঞ করার অধিকার আছে। রাজা পুরুকুৎস বন্দি হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করেন।[৩৫] যজ্ঞপত্নীর কর্তব্যের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে[৩৬] 'আশ্বলায়ন স্রোতসূত্রে'। বিপত্নীক কোনো পুরুষের যজ্ঞ সম্পাদনের কোনো অধিকার নেই। *রামায়ণে* কথিত আছে— রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়ে যজমানের অধিকার লাভার্থে সীতার এক স্বর্ণময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, কেননা ওই সময় সীতা ছিলেন নির্বাসনে। *শতপথ ব্রাহ্মণে* স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে "স্ত্রী হলো যজ্ঞের এক অর্ধ্যাংশ।"[৩৭] দেবতারা অবিবাহিতের হাত থেকে আহুতি গ্রহণ করেন না।[৩৮] অশ্বমেধযজ্ঞে যজমান রাজার প্রধান মহিষী এবং অন্য পত্নীগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলি সুসম্পন্ন করেন।[৩৯]

সপত্নীর আচরণ

সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে সপত্নী বিরোধের যে চিত্র *ঋগ্‌বেদে* পাওয়া যায় তা রীতিমত কৌতুককর ও ভয়াবহ। সতীনকে এড়িয়ে স্বামীকে বশিভূত করার মানসে স্ত্রীর করুণাকুলতা বহু ঋকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কেবল নিজেকে 'স্বামীর নিকট আদরণীয়'[৪০] করে তুলতেই স্ত্রী ক্ষান্ত হয়নি; স্বগর্ভজাত কন্যাকে সতীন কন্যা অপেক্ষা স্বামীর নিকট আদরণীয় করে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। 'আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত'।[৪১] এক বনে যেমন দুটি সিংহ থাকে না, এক স্বামীর তেমনি দুই স্ত্রী থাকবে না। সপত্নী পীড়নে জর্জরিত নারীর সগর্ব ও হিংস্র ঘোষণাপত্র লক্ষ করা যায় : "আমার শত্রু জীবিত রাখি না, শত্রুদের আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। ... আমি সকল সপত্নীকে জয় করেছি, পরাস্ত করেছি।"[৪২] সতীনদের পরাস্ত করার ফলস্বরূপ "আমি এ বীরের (স্বামীর) উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি" ।[৪৩] সে যুগে সপত্নীদের কত নির্মমভাবে পীড়ন করা হতো তার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় *ঋগ্‌বেদের* দশম মণ্ডলের পঁয়তাল্লিশ সূক্তের কতিপয় ঋকে: "এই যে তীব্র শক্তিযুক্তলতা, এ ওষধি, এ আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করছি, এ দিয়ে সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, এ দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।"[৪৪]

সপত্নী পীড়নের পর স্বামীকে বশ করার জন্য তুক-তাকের সঙ্গে বশিকরণ মন্ত্রও উচ্চারিত হয়: "হে পতি এ ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। সে শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন নিম্ন পথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন

তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়।"[৪৫] এ সমস্ত ঋকের মাধ্যমে বোঝা যায়, স্ত্রী-জাতি স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে কিন্তু সতীনের হাতে নয়। অনুরূপ স্ত্রী-জাতির কামনা বাসনার ফলাফল লক্ষ করা যায় *অথর্ববেদে*। এই বেদের চতুর্দশ কাণ্ডে স্ত্রীলোকের বিবিধ কামনা-বাসনা পূর্তি তথা অনুষ্ঠানের ব্যবহারের নিমিত্ত কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। এ শ্রেণীর কতিপয় মন্ত্রকে 'স্ত্রীকর্মণি' বলে অভিহিত করা হয়। এ সমস্ত মন্ত্র মনোমত পতিলাভ, সুখপ্রসব, সন্তান লাভ, গর্ভরক্ষা;[৪৬] স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনা ইত্যাদি নারী সমাজের নানাবিধ সুখশান্তি বর্ধক কর্মে ব্যবহৃত হতো। এ প্রসঙ্গে *অথর্ববেদের* ৪/৫ সূক্তটি আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে নিদ্রাকর্ষণের জন্য প্রযোজ্য সূক্ত হলেও এটি যে প্রেমিক পুরুষের প্রেমিকার সমীপে অভিগমনের সুবিধার্থে যাদুমন্ত্র হিসেবে প্রযুক্ত হতো তা নিম্নোক্ত মন্ত্রটি থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায়: "(যে স্ত্রীকে বশিভূত করতে চাই) তার মা নিদ্রাভিভূত হোক, তার পিতা, গৃহের পরিরক্ষণের জন্য দ্বারে নিযুক্ত কুকুর, গৃহপতি জ্ঞাতিগণ এবং বাইরে নিযুক্ত রক্ষক সকলে নিদ্রাভিভূত হোক"।[৪৭] এ শ্রেণীর অন্যান্য কিছু সংখ্যক যাদুমন্ত্র জাতীয় যেগুলি নরনারীর পারস্পরিক বশিকরণ কার্যে এবং বিবাহিত জীবনের অশান্তি লাঘব করার নিমিত্তার্থে প্রযোজ্য। সপত্নীবিনাশ, সপত্নীর আকর্ষণ হতে পতিকে রক্ষা অথবা স্বামীর ঈর্ষামূলক মনোভাব হতে নির্বিঘ্ন হওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যও মন্ত্র পাওয়া যায় *অথর্ববেদে*। এই বেদের ষষ্ঠকাণ্ড (১৩০-১৩৮ নং মন্ত্র) বিমুখ কোনো পুরুষকে আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে কোনো রমণী কর্তৃক পাঠের জন্য রচিত। মন্ত্রটি পাঠ করার সময় বিমুখ পুরুষটির একটি মৃন্ময়মূর্তি তৈরি করে শণের 'জ্যা' যুক্ত ধনুকে বান যোজনা করে সেই মূর্তির হৃদয়ে বিদ্ধপূর্বক মন্ত্রপাঠ করলে স্ত্রীলোকের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়— এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রতিমন্ত্রের সমাপ্তিতে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, "হে দেবগণ, (ওই পুরুষের চিত্তে) কামনা প্রেরণ করুন। আমার প্রতি প্রেমাবেগে তার চিত্ত আপ্লুত হোক"।[৪৮]

সপত্নী বা প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর বিনাশের জন্য প্রযোজ্য মন্ত্রও *অথর্ববেদে* পরিলক্ষিত হয়। যেমন বলা হয়েছে, "হে রাজন যম, তোমার বধূরূপে মনোনীত এই কন্যা পতিগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে যেন তার মাতা, ভ্রাতা ও পিতার গৃহে আবদ্ধ থাকে।"[৪৯]

বেদপাঠে অধিকার

পাণিনি কঠী, কলাপী, বহবৃচী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কতিপয় সূত্র রচনা করেছেন। বেদের 'কঠ' শাখায় সুপণ্ডিত একজন স্ত্রীলোক 'কঠী' নামে অভিহিত। 'বহবৃচ' শব্দ হতে 'বহবৃচী' শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং যে নারী 'বহবৃচ' শাখা পাঠ করেছেন তিনি 'বহবৃচী' নামে অভিহিত হন। 'কলাপ' শাখায় নিষ্ণাত একজন নারীকে বলা হয় কলাপী।[৫০] পাণিনির এই সূত্রগুলি হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে তদানীন্তনকালে শিক্ষিত নারীদের বেদপাঠে ছিল পূর্ণাধিকার। এছাড়া বেদে বহুসংখ্যক নারী ঋষির সন্ধান মেলে যাঁরা বেদের বিভিন্ন সূক্ত অবেক্ষণ বা দর্শন করেছেন; বেদপাঠে নারীর অধিকার না থাকলে এঁরা বেদের নারী ঋষি হিসেবে অভিহিত হতো না।

সহমরণ, বিধবা বিবাহ এবং পতিতাবৃত্তি

ঋগ্‌বেদের সমাজব্যবস্থায় সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল না। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার কথা *ঋগ্‌বেদের* কোথাও নেই। বৈদিক ঋষিগণের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিধবা নারীর বেঁচে থাকার অধিকার চিরতরে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং সদ্যোবিধবাকে উদ্দেশ্য করে ঋষির যে উক্তি তাতে সমাজে বিধবারও যে স্থান ও প্রয়োজন আছে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে— "হে নারী! সংসারের দিকে ফিরে চলো, গাত্রোত্থান করো; তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু হয়েছে। চলে এসো, যিনি তোমার পাণি গ্রহণ করেছিলেন সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল (তা) সকলই তোমার করা হয়েছে।"[৫১]

পরবর্তীকালে সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক বা আর্যবহির্ভূত অন্য কোনো সভ্যতার প্রভাবেই হোক সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উল্লেখ আছে *অথর্ববেদে*। সেখানে বলা হয়েছে— "দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে।"[৫২] অথবা "এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে।"[৫৩] *ঋগ্‌বেদের* সময়ে এই প্রথার প্রচলন না থাকায় বিধবা রমণীদের বেঁচে থাকার কোনো অসুবিধা ছিল না। অনেক সময় তাদের দ্বিতীয় বার বিবাহও হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবরের সঙ্গেই তারা আবদ্ধ হতো পরিণয় সূত্রে;[৫৪] তবে দেবর ছাড়া অন্যকে বিবাহ করবার অধিকার বৈদিক রমণীদের ছিল।

বৈদিক সমাজে পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল দাম্পত্য পবিত্রাদর্শের পাশাপাশি। *ঋগ্‌বেদে* বলা হয়েছে— "হে উষা, তুমি কুলটার ন্যায় না হয়ে পতি সমীপ গামিনী রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হও।"[৫৫] এমনি প্রভৃত মন্ত্র এর প্রমাণ বহন করে। বিপথগামিনী নারী বৈদিক সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয়া ছিল অথচ কুমারীর[৫৬] গর্ভজাত সন্তান আপন কর্ম ও মনীষার মাধ্যমে সমাজে বিশিষ্ট পদবী লাভ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

নারী অধ্যাপিকা

বৈদিক যুগে বহু নারী অধ্যাপিকার সন্ধান মেলে। পাণিনি 'আচার্যা' এবং 'আচার্যাণী', 'উপাধ্যায়া' ও উপাধ্যায়ানী'— এ দুটি শব্দযুগলের পার্থক্য নির্ণয় করার মানসে সূত্র রচনা করেছেন। 'আচার্যা' ও 'উপাধ্যায়া'-এর অর্থ নারী অধ্যাপিকা। এবং 'আচার্যাণী' ও 'উপাধ্যায়ানী'—এঁরা হলেন গুরুপত্নী। এই গুরুপত্নীগণ শিক্ষিতা নাও হতে পারতেন। পাণিনির এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পতঞ্জলি, তাঁর 'মহাভাষ্যে' 'আচার্যা' ও 'উপাধ্যায়া'—এ শব্দ দুটির উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ভারতের কতিপয় নারী অধ্যাপিকা তথা বিদ্যাবত্তার নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লিখিত অধ্যাপিকাদের মধ্যে 'আপিশালা' এবং 'ঔদমেধা' সবিশেষ উল্লেখ্য।[৫৭]

বৈয়াকরণ আপিশালী গোষ্ঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি শাখা যে নারী অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে 'আপিশালা' অভিধায় অভিহিত করা হতো। অনুরূপভাবে ঔদমেধীর (একজন আচার্যা) নারী ছাত্রদের বলা হতো 'ঔদমেধা' কিংবা 'ঔদমেধীর ছাত্র'।[৫৮]

পাণিনির একজন ব্যাখ্যাকার কাশিকাবৃত্তির লেখক কাশকৃৎস্ন 'ব্রাহ্মণী' নামে অভিহিত একজন নারী আচার্যার নামোল্লেখ করেছেন। তিনি 'কাশকৃৎস্ন'[৫৯] গোষ্ঠীর প্রণীত ব্যাকরণের একটি শাখায় অধ্যাপনা করতেন।

গার্গী

বহু সংখ্যক বিদুষী রমণীর নাম পরিলক্ষিত হয় বিশাল বৈদিক সাহিত্যে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন জ্ঞানী, বিদুষী ও তপস্বিনী নারী গার্গী। তিনি বচক্লুর কন্যা। তদানীন্তন যুগের প্রথিতযশা বিদুষী নারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্যা। তৎকালীন সময়ে রাজা জনকের রাজসভায় প্রভূত জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ তথা ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে বিতর্ক-বিচার হতো। এই রাজসভাতেই ঘটেছিল বৈদিক যুগের এক স্মরণীয় ঘটনা, যা বিস্ময়করও বটে। এখানেই ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্য ঋষিগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিখ্যাত বিতর্ক ও বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচারে যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্য ঋষিগণ পরাজিত হলেন তখন গার্গী তাঁকে আহ্বান জানালেন বিতর্কে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।[৬০] বিতর্কের ফলাফলে কারো জয় পরাজয় নির্ণীত হয়নি। তাঁদের দার্শনিক বিতর্কে উভয়ই সমান পারদর্শী বলে ঘোষিত হয়েছিলেন, যা নারী সমাজের অনুপ্রেরণার বিষয়ও বটে।

মৈত্রেয়ী

একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক আলোচনা *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* পাওয়া যায়, যা যাজ্ঞাবল্ক্য ও তাঁর সুপ্রিয়া পত্নী মৈত্রেয়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৬১] ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দু'জন স্ত্রী। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা ঋদ্ধা মৈত্রেয়ী। অন্যজন কাত্যায়নী পার্থিব বোধ সম্পন্না সাংসারিক রমণী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে পার্থিব স্থাবর-অস্থাবর দ্রব্যাদি দু'পত্নীর মধ্যে সমানুপাতে বন্টনে অভিলাষী। এমতাবস্থায় মৈত্রেয়ী তাঁর নিকট সবিনয়ে জানতে চান, "যদি আমার এই সংসার ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়, তাহলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব"।[৬২] যাজ্ঞবল্ক্য বিস্ময়বোধ করেন; এবং জানান, "ধন তথা পার্থিব বিত্তের মাধ্যমে অমৃতত্ব লাভের আশা নেই।"[৬৩] একথা শ্রবণ করে মৈত্রেয়ী বলেন, "যা আমাকে অমৃতত্ব বা ব্রহ্মপদ দিতে পারবে না তা (পার্থিব দ্রব্য) দিয়ে আমি কি করব"।[৬৪] মৈত্রেয়ীর এই স্মরণীয় উক্তি প্রতি যুগের সাধু ও সত্যানুসন্ধানীদের হতবাক করে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের এক নারীর চিত্তে উত্থিত এই আধ্যাত্মিক আলোক, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা, অমৃতের স্পৃহার উচ্চ প্রশংসা করেছেন ভিন্টারনিৎসসহ অন্য পাশ্চাত্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ। মৈত্রেয়ীর বাণীতে মানবাত্মার সেই চিরন্তন অমিয় বার্তা শুনতে পাওয়া যায় মেথিউ আরনল্ড যাকে বলেছেন, 'Divine Discontent' অর্থাৎ 'ঈশ্বর প্রদত্ত অসন্তোষ।'[৬৫] তিনি স্মরণ করে দিতে চেয়েছেন যে বস্তুগত সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব ধনাগার মানুষের আধ্যাত্মিক লিপ্সাকে চরিতার্থ করতে তথা অমৃতত্ব দান করতে পারে না মানবসত্তাকে।

গন্ধর্বানুগৃহীতা বিদুষী কুমারী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৬৬] গন্ধর্ব প্রভাবে প্রভাবিত এক বিদুষী নারীর (গন্ধর্ব গৃহীতা কুমারী) কথা উল্লিখিত হয়েছে। একবার পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয় 'অগ্নিহোত্র'[৬৭] নামে প্রাত্যহিক হোমটি দু'দিনে অথবা একদিনে সম্পাদিত হবে এই নিয়ে। ব্রাহ্মণদের 'অগ্নিহোত্র' প্রত্যহ সকালে এবং বিকালে দু'বার সম্পন্ন করতে হতো। প্রত্যূষের হোম ও সায়ন্তন হোম, এভাবে ধরলে যাগটি একদিনে নিষ্পাদ্য বলা যায়। আবার যদি পূর্বদিনের সায়ন্তন হোম হতে শুরু করে পরবর্তী দিবসের প্রত্যূষের হোমাবধি সময় নির্ণয় করা যায় তাহলে 'যাগ'টি দু'দিনে নিষ্পাদ্য বলে পরিগণিত হতে পারে। মতবিরোধটি এভাবেই শুরু হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে। এই মতবিরোধের নিষ্পত্তি করতে বিদ্বান ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ নামগোত্রহীন এবং শুধুমাত্র 'কুমারী' নামে উল্লিখিত এক বিদুষী রমণীর নিকট উপস্থিত হন। ওই বিদুষী রমণী দ্বিতীয় মতটি (দুইদিনে নিষ্পাদ্য) সমর্থন করেন; এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে সায়ন্তন হোম সূর্যাস্তের পর ও প্রত্যূষের হোম সূর্যোদয়ে প্রদত্ত হয়। এভাবেই সেই বিদুষী নারী পুরোহিতদের মতবিরোধের অবসান ঘটান।

দিক্‌দর্শন

বৈদিক যুগে নারী ঋষিরা যে সুপণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে নারীদের জ্ঞানার্জন, নৈতিকাদর্শ, তপস্বী জীবনযাপন এবং ব্রহ্মবাদিনীদের শিষ্য পরম্পরাগত ঐতিহ্য বৈদিক পরবর্তী যুগেও লোপ পায়নি। মহাকাব্যগুলিতে দেখা যায় বিদুষী নারী ও তপস্বিনীদের নামোল্লেখ আছে। রাজা জনকের রাজসভায় ভিক্ষুণী 'সুলভার' আধ্যাত্মিক আলোচনা *রামায়ণের* একটি অত্যুজ্জ্বল অংশ হিসেবে উল্লিখিত। রামচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎরতা ঋষি 'শরবী' সুপণ্ডিত সিদ্ধা তাপসী হিসেবে বর্ণিত। তাছাড়া *মহাভারতে* দ্রৌপদীর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা বিদুষী নারীর পরিচয় বহন করে। যোগাবশিষ্টের স্বামী শিখিধ্বজের মোহমগ্ন আত্মাকে উদ্দীপিত ও জাগ্রত করতে রানী চূড়ালা যে সকল তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া ভারত ভ্রমণকালে মেঘাস্থিনিস চিরকৌমার্য পালনরতা বহু সুপণ্ডিত তপস্বিনীকে দেখেছিলেন, যারা সুগভীর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক বিভিন্ন বিতর্কে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি লিখেছেন, "বহুনারী বিদ্বান চিরকুমার পুরুষ ঋষিদের ন্যায় চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র চর্চা করিতেন। এবং ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।"[৬৮]

ললিতকলা

রমণীদের নৃত্যবিদ্যা, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হতো বৈদিক যুগের সমাজে। যদিও সংগীত, নৃত্যকলা নারী-পুরুষ উভয়ই অভ্যাস করত তথাপি ললিতকলাকে নারীর শিক্ষণীয় বিদ্যা বলেই মনে করা হতো। গীত ও নৃত্যকলা অনুশীলন স্ত্রীলোকদের কার্য। এ কথা বহুবার বিবৃত হয়েছে বেদে। সংগীত ও নৃত্যের প্রথম উদ্ভব সম্বন্ধে *শতপথ ব্রাহ্মণে* একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণিত আছে : "একদা গন্ধর্বগণ দেবতাদের নিকট থেকে সোমরস চুরি করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় দেবতারা চিন্তা করলেন, গন্ধর্বগণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তিপরায়ণ। তজ্জন্য তাঁরা সঙ্গীত ও নাট্যকলা সৃষ্টি করলেন। এবং বাগ্‌দেবীকে তা শিক্ষা দিলেন। দেবী বাক্ গান গেতে গেতে

ও নাচতে নাচতে তাঁর বীণার ঝঙ্কারে গন্ধর্বদের নিকট উপস্থিত হলেন। গন্ধর্বগণ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করে, নৃত্যকলা দর্শন করে এবং অপরূপবেশধারিণী দেবীর রূপে বিমোহিত হলেন। দেবী তখন অনায়াসেই তাঁদের বিমূঢ়াবস্থার সুযোগ নিয়ে অপহৃত সোমরস এনে দেবতাদের প্রত্যর্পণ করলেন"।[৬৯] এই চমকপ্রদ কাহিনী থেকে বোঝা যায় সংগীত ও নৃত্যকলায় নারীদের মানাত বেশি এবং তাঁরা এ বিষয়ে পারঙ্গমও ছিল।

সামগীতে দম্পতি

শতপথ ব্রাহ্মণের[৭০] একটি উক্তি হতে অবগত হওয়া যায় যে পুরাকালে *সামবেদের* উদ্‌গাতা পুরোহিতগণের পত্নীরা যজ্ঞে সামগান পরিবেশন করতেন। পরবর্তীকালে তাঁদের পতিগণ যখন সামগান গাওয়া আরম্ভ করেন তখন পত্নীগণ এ কার্য থেকে বিরত হন। এই উদ্‌গাতা পুরোহিতগণ প্রধানত তাঁদের পত্নীগণের কর্ম সুসম্পন্ন করতেন। এখান থেকেই নারী-পুরুষের সামগান গাওয়ার রীতি প্রচলিত হয়।

শিল্প

বৈদিক যুগে সেলাই, বয়ন, পশমের কাজ, বস্ত্রালংকরণ প্রভৃতি কর্ম নারীগণ অভ্যাস করত। এবং এ গুলি স্ত্রীলোকের কলাবিদ্যা হিসেবে সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে।[৭১] পশম শব্দের অর্থ হচ্ছে 'উর্ণা', যা বয়ন কার্যের জন্য অত্যাবশ্যক। সেলাই কর্মের নিমিত্ত সূতার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া *শতপথ ব্রাহ্মণের* অন্য একটি উক্তি থেকে জানা যায়, "রমণীগণ অসার জাঁকজমকপ্রিয়"।[৭২] অলংকারশূন্য শোভাহীন বস্ত্রাদি তাদের অপছন্দ। তাই নিজেদের সুসজ্জিত ও সুশোভন করে তুলতে তারা সদা সর্বদা সচেষ্ট। এ থেকে মনে হয় বস্ত্র অলংকরণের কাজ করে তারা নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ সুন্দরতর করে তুলতে ভালোবাসত। বৈদিক যুগে এই অলংকরণ শিল্পকর্মটি বেশ জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি এবং সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যকর্মে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তদানীন্তনকালে এই অলংকরণ কর্মটিকে অভিহিত করা হতো 'পেশস্করণ' হিসেবে। 'পেশ' শব্দটি অলংকরণের সমার্থক শব্দ। কাপড়ে ফুল তোলা প্রভৃতি কাজ বৈদিক যুগের রমণীরা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করত। তৎকালে অলংকরণ শিল্পে সুদক্ষা বালিকা বা নারীকে বলা হতো 'পেশস্করী'। বৈদিকোত্তরকালে ওই (পেশস্করী) শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছিল সুন্দর মনোলোভা বর্ণ ও চিত্তাকর্ষক আকৃতি বিশিষ্ট রঙিন পতঙ্গ; চলতি গেঁয়ো বাংলায় যাকে 'কাঁচপোকা'[৭৩] হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালে রমণীগণ যে অতি উচ্চ মানের বস্ত্রালংকার কার্যে সুদক্ষ ছিল তা *ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়* ব্রাহ্মণে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিধৃত আছে—"তাহারা বস্ত্রের দুই সীমানায় (পাড়ের কাছে) ফুলতোলা প্রভৃতি অলঙ্করণ কর্মে অভ্যস্ত ছিলো, অঞ্চলদেশে ও বস্ত্রের মধ্যভাগে বিভিন্ন বর্ণের সূত্র দ্বারা সুশোভন করে তুলতো"[৭৪] তাছাড়া রমণীগণ সুবর্ণসূত্র, রজতসূত্র ও রঙিন সূত্র মিশিয়ে রাজসিংহাসনের ও কাষ্ঠাসনের চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার্থে নরম আস্তরণ তৈরি করত। এই সকল উপাধানতুল্য আস্তরণকে 'হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যর্কুচ'[৭৫] বলা হতো।

সূতা তৈরি

বৈদিক যুগে 'রজয়িত্রী' নামে অভিহিত রমণীগণ রঞ্জক সূতা এবং বস্ত্রাদি রং করত। মঞ্জুষা (ঝুড়ি) নির্মাণ, রজ্জু তৈরি, তুলা হতে সূত্র প্রস্তুত এবং অনুরূপ কুটির শিল্পগুলি সেই যুগের মহিলারাই সম্পাদন করত। *শুক্ল যজুর্বেদের* ত্রিংশতম অধ্যায়ে তদানীন্তন বৈদিক ভারতে প্রচলিত সত্তরটি (৭০) পেশা বা জীবিকার নামোল্লিখিত আছে। সেগুলোর মধ্যে মাত্র আটটি কর্ম বা বৃত্তি কেবল নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।[৭৬] অন্যগুলো সম্পন্ন হতো পুরুষদের মাধ্যমে।

অলংকার

বৈদিক যুগে স্বর্ণালংকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এবং নারী-পুরুষ উভয়ই এই অলংকার ব্যবহার করত। *ঋগ্বেদে* স্বর্ণবলয়, সুবর্ণ কবচ, হিরণ্যশিবস্ত্রাণ বা উষ্ণীব হিরণ্যকুণ্ডল, সুবর্ণ রুক্ম অর্থাৎ স্বর্ণহার প্রভৃতি স্বর্ণালংকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৭৭] তৎকালীন সমাজে 'খাদি' বলতে 'বলয়' এবং 'রুক্ম' অর্থে সুবর্ণের অলংকার বোঝান হতো।

সেনাবাহিনী

ঋগ্বেদের কিছু কিছু মন্ত্র হতে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা নারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রমণীকুলের অপূর্ব রণকৌশলের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় বৈদিক যুগে। তৎকালীন খ্যাতনামা রাজাদের মহিষীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোভাগে নির্ভীক মনে যুদ্ধ করত। রাজা নমুচির আদেশে তাঁর পত্নী অতি দুর্গম অথচ ভয়ংকর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজা খেলের রাণী বিশ্পলার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর কথা *ঋগ্বেদের* অশ্বিনী সূক্তে[৭৮] বিধৃত আছে। "একদা বিশ্পলা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা সম্মুখে অবস্থানরতা তথা শত্রু সেনার সাথে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় তিনি ঊরুতে অত্যন্ত গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর একটি ঊরু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিলো এবং লৌহনির্মিত একটি কৃত্রিম ঊরু তাঁর দেহে অস্ত্র চিকিৎসকগণ সংযোজন করেছিলেন।"[৭৯] এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় বৈদিক যুগের নারীরা সামরিক বাহিনীতে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ কার্য পরিচালনা করত। এছাড়াও সেই যুগে উন্নত চিকিৎসার প্রমাণও বহন করে উপর্যুক্ত ঘটনাবলি।

বীরাঙ্গনা মুদ্গলানী

মুদ্গলানী অপর একজন নির্ভীক চিত্তের বীরাঙ্গনা নারী যোদ্ধা। বৈদিক যুগের ইতিহাসে মুদ্গলানীর নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন রাজা মুদ্গলের সহধর্মিণী। *মহাভারত*খ্যাত অসীমা সাহসিনী সুভদ্রার ন্যায় মুদ্গলানী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর রথ পরিচালনা এবং যুদ্ধ করে অর্জন করেছিলেন অসাধারণ কৃতিত্ব। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও রথ চালিয়ে তিনি স্বামীর শত্রু নিপাত করতে সমর্থ হন। এবং প্রতিপক্ষ শত্রুসেনাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। দ্রুত অনুসরণ করে পলায়নরত বহু শত্রুসৈন্যকে একাকী বন্দি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, নির্ভীক চিত্তে।

নির্ভীক দুর্জয় সাহসী দৃঢ়চেতা মুদ্গলানী কর্তৃক শত্রুর পশ্চাৎধাবন এবং বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধের সুন্দর মনোরম বর্ণনা আছে। *ঋগ্বেদে* বলা হয়েছে—"রথচালনাকালে তাঁহার বস্ত্র রথবেগবশে স্ফীত হইয়া বাতাসে উড়িতেছিলো। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তিনি হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করেছিলেন।"[৮০] এ থেকে মনে হয়, বৈদিক সমাজে নারীও বীরোচিত কর্মে দক্ষতার পরিচয় রাখতেন।

সেনাবাহিনীতে অনার্যজাতি

বৈদিক যুগে দাসবর্ণের অনার্যদের সেনাবাহিনীতে ছিল অসংখ্য নারী সেনার সমাবেশ। *ঋক্সংহিতার* কতিপয় মন্ত্রে দাসবর্ণের নারীগণ যে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ তথা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তার প্রমাণ মেলে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো এক আর্য-যোদ্ধার উক্তি, "দাসজাতি তাদের স্ত্রীলোকদের অস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধে নিযুক্ত করে; তাদের অবলা স্ত্রী সেনা আমার কি ক্ষতি করবে?"[৮১] এ থেকে মনে হয়, অনার্যজাতির মহিলারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হতো। বৃত্রাসুরের মাতা ইন্দ্রদেবতার সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিলেন।

উল্লিখিত বৈদিক যুগের নারীদের সামাজিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যে অবস্থান ছিল সেটি সময়ের অগ্রগতিতে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে কিরূপ হয়েছিলো তা পর্যালোচনা করার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রকার 'মনু'র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

বৈদিক পরবর্তী যুগ

পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে নারীদের বিভিন্ন প্রথার পরিবর্তন হতে থাকে। ধর্মানুশীলনে তাদের ন্যায্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এবং স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে শুধুমাত্র পুরুষরা নৈবেদ্য দেওয়ার অকুণ্ঠাধিকার পায়। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচারানুষ্ঠান হতে ধীরে ধীরে নারীদের অন্ধকারে রাখা হয়। (নারীদের বঞ্চিত করা হয়) ক্রমে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন এবং তাদের ন্যায্যাধিকার সংকুচিত করা হয়।

> From the time of Brahmans distinct traces of lowering of the position of women is noticed and liberty given to women became gradually restricted.[৮২]

এ প্রসঙ্গে মনুস্মৃতি সম্পর্কে ড. জোঠিয়া ধীরাসেকরের মন্তব্য উল্লেখ্য :

> In the manusmriti we witness the cruel infliction of domestic Subservience of woman. The road to heaven is barred to her and there is hard bargaining with her for the offer of an alternative route. Matrimony and obedience to the husband are the only means whereby a woman can hope to reach heaven.[৮৩]

মনু বলেন

মনুসংহিতা থেকে নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

> (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই; কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। (৫/১৫৫)

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না; স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোনো মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই—এ জন্য ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ। (৯/১৮)

স্ত্রীজাতি,—কৌমারাবস্থায় পিতা কর্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তাকতৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র কর্তৃক রক্ষণীয়া, ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নহে। (৯/৩)

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়া স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ মাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। (৫/১৪৭)

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে— কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। (৫/১৪৮)

নারী কখনো বেদ নির্দেশিত যাগ যজ্ঞ বা দৈনন্দিন হোমনৈবেদ্য ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারবে না, যদি করে তাহলে সে নরকগামী হবে।[৮৪]

স্ত্রীলোক পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে কখনো চেষ্টা করিবে না; ইহাদের সহিত পৃথক হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল—উভয়কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। (৫/১৪৯)

কামিনীরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপই হউক আর কুরূপই হইক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকে। (৯/১৪)

পুরুষ সন্দর্শন মাত্রে তদ্ভোগাভিলাষশীলতা হেতু, স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতা বশত পতিকর্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রী জাতি ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। (৯/১৫)

নারী ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ; ক্ষেত্র ও বীজ উভয় সংযোগে যাবতীয় শরীর সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। (৯/৩৩)

উপর্যুক্ত উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের নারী সমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য একমাত্র মনুই দায়ী। এ প্রসঙ্গে ড. বি. আর আম্বেদকর বলেন—

Who was responsible for their fall? It was Manu, the Law-Giver of the Hindus. There can be no other answer.[৮৫]

নারী সম্পর্কিত মনুর বিপরীত ভাষ্য

নারী এবং বিশেষ করে দারস্থ নারী সম্বন্ধে মনু যে খুব উন্নত অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করতেন তার বহুবিধ দৃষ্টান্তও *মনুসংহিতায়* প্রাপ্য। বিবাহের সময় শুধুমাত্র বরই যে কন্যাকে ধনালংকারবস্ত্রাদি প্রদানেচ্ছুক তা নয়, কন্যার পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা ও দেবরগণেরও দায়িত্ব ছিলো কন্যাকে সাদরে সম্ভাষণ ও ভূষণাদির মাধ্যমে সম্ভূষিত করা। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে :

যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন হন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়া কর্ম সমুদয়ে বৃথা হইয়া যায়। (৩/৫৫-৫৬)

যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেইকুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেথায় স্ত্রী লোকের কোনো দুঃখ নাই, সেই পরিবারে সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। (৩/৫৭)

> যে পরিবার মধ্যে ভর্তা ও ভার্যা পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। (৩/৬০)
>
> বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে, নারী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারেন না। আর স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সন্তানোৎপাদন হয় না। (৩/৬১)
>
> স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকেন, তবে সমুদয় গৃহই শোভা পাইতে থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয় তাহা হইলে সমুদয় গৃহই শোভাবিহীন বোধ হয়। (৩/৬২)

অন্য প্রসঙ্গে *মনুসংহিতায়* স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মনু আবার বলেছেন :

> গৃহালঙ্কার ভূতা কামিনীগণ মহাকল্যাণকর, প্রজোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণ ভাজন এবং মানার্হ হইয়া থাকে, একারণে গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী—এতদুভয়ের কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না। (৯/২৬)
>
> অপত্যোৎপাদন, সঞ্জাত-তনয়ের পরিপালন এবং লোকযাত্রা-নির্বাহার্থ অতিথি সৎকারাদি সাংসারিক কার্যনির্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্যাই প্রধান সাধন। (৯/২৭)
>
> ধর্মকার্যানুষ্ঠান, অপত্য লাভ; শুশ্রূষা, উৎকৃষ্ট রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি—এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্যায়ত্ত। (৯/২৮)

স্ত্রীলোক সম্পর্কে মনুর পূর্বাভিমতগুলির সঙ্গে এ সমস্ত প্রশংসাসূচক উক্তি নিশ্চিতভাবে সংগতিহীন। নিন্দোক্তিগুলিকে উদ্ধৃত করে কোনো কোনো সমালোচক নারী জাতি সম্পর্কে মনুর বিরূপ মনোভাব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। তারা তখন বিস্মৃত হন, মনু বহুবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন। একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয় যে, স্ত্রীলোক সম্পর্কে মনু যেসব নিন্দাসূচক শ্লোক রচনা করেছেন, তা বিশেষ বিশেষ কিছু দুশ্চরিত্রা রমণীদের প্রতি লক্ষ রেখে—সেসব নারীকে সকল দেশে ও সকল কালেই দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই সব নিন্দাসূচক উক্তিকে যারা সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হন, তারা একদেশদর্শী। ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য মনে করেন,

> এগুলি হল নিপট নারী নিন্দা, মনুর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা হচ্ছে, "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি"[৮৬]—অর্থাৎ মাছিরা যেমন প্রাণী দেহের ক্ষতস্থানগুলিই কেবলমাত্র খুঁজে বেড়ায়, তেমনি পরবর্তীকালের কোনো নারীদ্বেষী তথাকথিত সমাজ-সংস্কারক এই সব নারী-অবমাননাকর শ্লোক রচনা করে মনুসংহিতার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলো। এগুলি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।[৮৭]

তাহলে বলা যায়, মনু নারীদের অসম্মানজনক অবস্থায় দেখতে চাননি। তিনি *মনুসংহিতায়* যা ভাষ্য করেছেন তা মূলত নারীসমাজের মঙ্গল ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের তাগিদেই। ফুলে যেমন মধু আছে তেমনি বিষও থাকে। ঊর্ণনাভ বিষ সংগ্রহ করে, মধু সংগ্রহ করে মৌমাছি। তদ্রূপ একই *মনুসংহিতায়* উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দ্বৈত বিষয় বর্তমান। যারা রমণীকে অসহিষ্ণু ও অসংবেদনশীল মনে করেন তারা মনুর অপকৃষ্ট উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে সমাজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার অনৈতিক চেষ্টা করেন। কিন্তু যারা নারীকে সহিষ্ণু ও সংবেদনশীল কিংবা মাতা, ভগিনী অথবা ভার্যাজ্ঞানে অনুধাবন করেন তারা মনুর প্রশংসামূলক উৎকৃষ্ট উক্তিগুলি পর্যালোচনায় নিয়ে নারীকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করার মানসিকতা পোষণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান ছিলো সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। নারীদের অবহেলা বা উপেক্ষার নিদর্শন

ঋগ্‌বেদের কোথাও আছে বলে মনে হয় না। প্রীতি আদর ও উপযুক্ত সম্মানের সাথে তাদের ন্যায্য অধিকারের মর্যাদা ও সম্ভ্রম যথাযথভাবে হয়েছে সুসংরক্ষিত। স্ত্রীর বাধ্য হওয়ার বিষয় তদানীন্তন যুগে নিন্দিত হয়নি বরং তা সগৌরবের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা তথা ব্রহ্মচর্যা, ব্রহ্মবাদিনী প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা প্রাচীন ভারতের রমণীগণের লাভ করার প্রভূত সুযোগ ছিল। যদিও কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের সমাদর তখনও বেশি ছিল, তথাপি কন্যা সন্তানের প্রতি কখনো অমর্যাদা করা হতো না। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য বিবেচনা করা হতো না। বৈদিক সংহিতা ও উপনিষদের কোথাও নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

> The wife and husband being the equal halves of one substance are equal in every respect.[৮৮]

ঋগ্‌বেদে জানা যায়, নারীরা (মেয়েরা) পুরুষদের মতো বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। বৈদিক যুগে পিতা কন্যাকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। ব্রাহ্মণ-ঔপনিষদিক যুগেও পিতা, মাতা ও পিতৃব্য মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। কোনো কোনো সময় গুরুগৃহেও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো। বেদ-স্মৃতিসহ বিবিধ ধর্মশাখা ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ-সুবিধা পুত্র-কন্যা উভয়ের জন্য অবমুক্ত ছিল। পুরুষের মতো নারীদেরও মন্ত্রপাঠের অধিকার ছিল। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনয়ন দেওয়া হতো। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মতে, নারীগণ গুরুগৃহে বেদের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করে মীমাংসা শাস্ত্রে পারঙ্গমতা লাভ করতেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতে, ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন মহিলা শিক্ষিকাগণ। এ প্রসঙ্গে ড. বি. আর. আম্বেদকর-এর বিবরণ প্রণিধানযোগ্য :

> That at one time a Woman was entitled to upanayana is clear from the Atharvaveda, a girl is spoken of as being eligible for marriage having finished her Brahmacarya. From the Shrouta sutras it is clear that women could repeat the mantras of that vedas and that women were taught to read the vedas, panini's Ashatdhayi bears testimony to the fact that women attended Gurukul (College) and studied the various shakhas (Sections) of the veda and became expert in Mimansa. Patanjali's Mahabhashya shows that women were teachers and taught vedas to girl students.[৮৯]

বেদ ও উপনষিদ সাহিত্য থেকে জানা যায়, নারীরা শুধু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন না, তাঁরা ধর্ম চর্চারও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতেন। অনেক মহিলা গৃহত্যাগ করে অনাগরিক জীবনাবলম্বন করে সন্ন্যাসিনী হতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে দর্শন ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যুৎপত্তি লাভ করতেন এবং বহু জটিল বিষয়ের সমাধান দিতেন। আবার অনেকে আধ্যাত্মিক সাধনায়ও প্রভূত উন্নতি লাভে সক্ষম হন। বস্তুত এ থেকে অনুমিত হয় বৈদিকোত্তর যুগ অপেক্ষা বৈদিক যুগেই সর্বতোমুখী নারী-শিক্ষার প্রসারের হার সমধিক উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। কিন্তু 'ধর্মসূত্র' ও 'মনুসংহিতার' যুগ থেকেই নারী শিক্ষার সমুন্নত প্রতিষ্ঠাভূমি ধীরে ধীরে ভাঙতে আরম্ভ করে। তখন থেকেই সমাজে নারীর অবস্থান ক্রমশ ধাবিত হতে থাকে অবনতির দিকে। অবলুপ্তির পথে লীন হতে থাকে নারীদের জাতকর্মাদি ও বেদ পাঠের অধিকার। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতে নারীদের

উন্নতাবস্থা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রকারদের বিধানে নারী তার পূর্বগৌরব থেকে হয়ে পড়ে বঞ্চিত।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ. ২৯-৩৪

২. অতুলচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *উপনিষদ* (অখণ্ড সংস্করণ) কলিকাতা, ১৯৮০, বৃহদারণ্যকোপনিষদ (৩-৪)।

৩. *উপনিষদ* (অখণ্ড সংস্করণ), পূর্বোক্ত, বৃহদারণ্যকে পনিষদ, ৬/৪/১৭, ৬/৪/১৮

৪. যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়*, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২০৩

৫. দ্র. *ঋগবেদসংহিতা*, ১ম মণ্ডল ১২৫ ও ১৭৯ নং সূক্ত, ৫ম মণ্ডল ২৮নং সূক্ত, ৮ম মণ্ডল ৯১নং সূক্ত, ১০ম মণ্ডল ৩৯, ৪০, ৮৫, ১২৫, ১৪৫, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ২০-২৮, ৯৫, ১০৮নং সূক্ত।

৬. ক) শ্রী জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২
খ) অধ্যাপক ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১১৪

৭. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

৮. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

৯. পূর্বোক্ত।

১০. দ্র. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত, *বিশ্বকোষ* (ষষ্ঠভাগ), কলিকাতা, ১৩০২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭

১১. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

১২. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৩. শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪

১৪. *অথর্ববেদসংহিতা*, ১১/৫/১৮

১৫. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/২৭/১২

১৬. *ঋগবেদসংহিতা*, ১/৬২/১১

১৭. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/২৭/১২

১৮. রমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, *ঋগবেদসংহিতা*, (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩; শ্রী জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

১৯. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/৩৯/১৪

২০. *ঋগবেদসংহিতা*, ১/১০৯/২

২১. *ঋগবেদসংহিতা*, ৬/২৮/৬

২২. *ঋগবেদসংহিতা*, ২/১৭/৭

২৩. যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

২৪. *ঋগবেদসংহিতা*, ৩/৩১/২

২৫. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

২৬. রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), *ঋগবেদসংহিতা*, (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৭১

২৭. *অথর্ববেদসংহিতা*, ৫/১৭/৮ ও ৫/১৭/৯

২৮. *তৈত্তিরীয় সংহিতা*, ৬/৫/৪/৩ এবং *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ১/৩/১০/৫৮

২৯. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

৩০. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/৮৫/৪৬

৩১. *ঋগবেদসংহিতা*, ৫/২৮/৩

৩২. *ঋগবেদসংহিতা*, ১/১২৪/৪

৩৩. *ঋগবেদসংহিতা*, ১/১৭৩/২

৩৪. *ঋগবেদসংহিতা*, ১/১৩১/৩

৩৫. রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, *ঋগবেদসংহিতা* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, ১৯৯৩, পৃ. ৫২০

৩৬. ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ২৭

৩৭. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৫/২/১/৪

৩৮. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৫/১/৬/১০

৩৯. ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৪০. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/১৫৯/৩

৪১. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/১৫৯/৩

৪২. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/১৫৯/৫

৪৩. *ঋগবেদসংহিতা*, ১০/১৫৯/৬

৪৪. *ঋগবেদসংহিতা* ১০/১৪৫/১

৪৫. *ঋগবেদসংহিতা* , ১০/১৪৫/৬

৪৬. *ঋগবেদসংহিতা* , ১০/১৬২/৬, ১০/১৮৩/৩ ও ১০/১৮৪/৩

৪৭. *অথর্ববেদসংহিতা*, ৪/৫/৬

৪৮. *অথর্ববেদসংহিতা*, ৬/১৩০/১

৪৯. *অথর্ববেদসংহিতা*, ১/১৪/২

৫০. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৫১. *ঋগবেদসংহিতা* , ১০/১৮/৮

৫২. *অথর্ববেদসংহিতা* ১৮/৩/৩

৫৩. পূর্বোক্ত, ১৮/৩/১

৫৪. (ক) রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), *ঋগবেদসংহিতা* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

খ) মনু উক্ত মত সমর্থন করেছেন : *মনুসংহিতা*, ৯/৬৯-৭০। পণ্ডিত প্রবর রোথ এ মতই গ্রহণ করেছেন। *মনুসংহিতা*, পৃ. ৫১২

৫৫. *ঋগবেদসংহিতা* ৭/৭৬/৩, অনুরূপঋক্ : ৪/৫/৫ এবং ১০/৩৪/৪

৫৬. *ঋগবেদসংহিতা* ৮/৪৬/২৪

৫৭. ক) ডঃ শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

খ) অধ্যাপক ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৫৮. ক) ডঃ দীলিপ কুমার ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), *ভট্টোজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী* (সংজ্ঞা ও প্রকরণ), ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৪

খ) যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৫৯. ক) *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২

খ) *ভট্টোজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী* (সংজ্ঞা ও প্রকরণ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৬০. 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ', ৩-৬/৩-৮; অতুলচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *উপনিষদ* (অখণ্ড সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৮০।

৬১. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২-৪, পূর্বোক্ত।

৬২. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২-৪-৩, পূর্বোক্ত।

৬৩. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২-৪, পূর্বোক্ত।

৬৪. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২-৪, পূর্বোক্ত।

৬৫. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

৬৬. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, ৪/২৫/৪

৬৭. ডঃ শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২

৬৮. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

৬৯. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ৩-২-৪

৭০. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ১৪-৪-৩-২

৭১. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ১২-৭-২-১

৭২. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৭৩. পূর্বোক্ত।

৭৪. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, ৩-১১-১০

৭৫. *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৭৬. বস্ত্রধৌতি, ঝুড়িপ্রস্তুতি, সুগন্ধি দ্রব্য নির্মাণ, কাজল প্রস্তুতি, তরবারির কোষ নির্মাণ, পুত্তলী নির্মাণ, বস্ত্রাদি রং করা, অলংকরণ বা পেশকরণ প্রভৃতি কর্ম বা বৃত্তি কেবল নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। *বেদের পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৭৭. *ঋগ্‌বেদসংহিতা*: ৭/৫৬/১৩,৪/৩৪/৯,৫/৫৪/১১,১/১১২/১৪,৭/৫৬/১৩

৭৮. *ঋগ্‌বেদসংহিতা* ১/১১৬/১৫

৭৯. রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), *ঋগ্‌বেদসংহিতা* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-৩৫

৮০. *ঋগ্‌বেদসংহিতা* ১০/১০২/২, ১০/১০২/১, ৬-১১

৮১. *ঋগ্‌বেদসংহিতা* ৭/৭৮/৫

৮২. Subhra Barua, *Monastic life of the Early Buddhist Nuns*, Calcutta, 1997, p- 3.

৮৩. *Mahabodhi Centenary Commemorative*, vol i & ii, Sambhasha, 1991, p-297.

৮৪. Ibid, p- 36-37.

৮৫. Ibid, p-308.

৮৬. V.R. Subramanian, *Maxims of Chanakya*, New Delhi, 1980, p. 101.

৮৭. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম*, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৫৩

৮৮. Subhra Barua, ibid, p.2.

৮৯. *Mahabodhi Centenary Commemorative*, vol i & ii, Ibid, p-307.